BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03120008

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 12| December 2025| e-ISSN: 2584-1890

দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের আদিবাসী ও অন্ত্যজ সমাজের প্রকৃতি আরাধনা ও পরিবেশ চিন্তা

অদ্বৈত কুমার রানা

Guest Teacher, Department of History, Garhbeta College, Paschim Medinipur, West Bengal, India.
Email: adwaitya1993@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কৃতজ্ঞ ছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য মানুষকে মুগ্ধ করে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থেকেই জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতি আরাধনা। আধুনিক সময়ে পরিবেশ চিন্তার ধারণা বিকশিত হয়েছে। তবে জঙ্গলমহল (দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ) অঞ্চলে আদিবাসী ও অন্ত্যজ সমাজের ধর্মচর্চায় এখনো প্রকৃতিবাদের আকর সুসজ্জিত ও অতিযত্নে লালিত হয়ে চলেছে। যা পালনে সাধারণ সম্প্রদায়ের মানুষের থেকে আদিবাসী ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষের ভূমিকা অগ্রগণ্যভাবে দেখা যায় তাদের পূজার্চনার মধ্য দিয়ে।

মূল শব্দ: *আদিবাসী, জঙ্গলমহল অঞ্চল, অন্ত্যজ সমাজ, প্রকৃতি, পূজা, পরব।*

মূল আলোচনা:

প্রাক্ বৈদিক ও বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ বিবিধ ঈশ্বর আরাধনায় নিবিষ্ট থেকেছে। এইসব আরাধনায় বেশিরভাগই প্রাকৃতিক উপাদানকে কেন্দ্র করে। স্বাভাবিকভাবে, মানুষ যখন প্রকৃতির কোলেই নিয়ন্ত্রিত ছিল তখন তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোকে প্রকৃতির রুষ্টতা হিসাবে বিবেচনা করে মাটি, বায়ু, সূর্য, নদী, বৃক্ষ, বৃষ্টি, চন্দ্র, পাহাড় ও বজ্রপাত ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে বহুবিধ পূজার্চনার আয়োজন করত। এছাড়াও রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রকৃতির কোলে বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবী সৃষ্টি করে পূজার্চনা করত। এই একবিংশ শতকে বিশ্ব প্রকৃতি নিধন যজ্ঞে প্রাচীন আধ্যাত্মবাদী চিন্তার অবকাশ নেহাতই স্বল্প। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে সাম্প্রতিক আরাধ্য আরাধনায় কী প্রকৃতি ব্রাত্য? প্রাচীন ভারতীয় গোষ্ঠীগুলোর বিবর্তনের সাথে সাথে প্রাকৃতিক উপাদানের আরাধনাও কী বর্জিত হয়েছে? এর ব্যাখ্যা বহুবিধ হতে পারে। তবে জঙ্গলমহল (দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ) অঞ্চলে আদিবাসী ও অন্ত্যজ সমাজের ধর্মচর্চায় এখনো প্রকৃতিবাদের আকর সুসজ্জিত ও অতিযত্নে লালিত হয়ে চলেছে। এই প্রবন্ধে প্রকৃতি আরাধনার রকমারি আয়োজন কীভাবে পরিবেশের প্রতি যত্নশীলতার প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছে—তা অন্বেষণের চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কৃতজ্ঞ ছিল। প্রকৃতির সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য মানুষকে মুগ্ধ করে। প্রকৃতির প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থেকেই জন্মগ্রহণ করে প্রকৃতি আরাধনা। আধুনিক সময়ে পরিবেশ চিন্তার ধারণা বিকশিত হয়েছে। পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি আমাদের চারপাশের সমস্ত প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট উপাদানের সমন্বয়। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য, কিন্তু এই কর্তব্য পালনে সাধারণ সম্প্রদায়ের মানুষের থেকে আদিবাসী ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষের ভূমিকা অগ্রগণ্যভাবে দেখা যায় তাদের পূজার্চনার মধ্য দিয়ে।

অরণ্যচারী অনার্য মানুষদের কাছে গাছ ছিল দেবতা। বৃক্ষ পূজা তাই একটি সুপ্রাচীন প্রথা। আদিবাসীদের শালুই পূজা, বোঙা ও সিনি দেব-দেবীদের পূজা হয় গাছের নীচে।[১] কোন বৃক্ষ ঝাড়ের তলায় থাকে সাঁওতালদের জাহের থান। কিন্তু গাছ কেটে এনে সেই গাছের পূজা করা আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। এর তাৎপর্য নিহিত আছে জঙ্গলমহলে (দ:-প: বঙ্গ) রাজা ও প্রজার সম্পর্কের সমীকরণের মধ্যে।[২]

জঙ্গলমহলে (দ:-প: বঙ্গ) আদিবাসীদের সংস্কৃতি আজ কিছুটা অবলুপ্তির পথে, দীর্ঘকাল আর্য সভ্যতার প্রভাব থেকে প্রাগার্য সংস্কৃতিতে বহু পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাগার্য কিংবা আদিবাসীদের সংস্কৃতি আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এই আদিবাসীরা হল সাঁওতাল, বাউরী, বাগদী, শবর, লোধা, কোড়া, খাড়িয়া, মহালী, ডোম ইত্যাদি বহু জনজাতি ও কোম। জঙ্গলমহলের (দ:-প: বঙ্গ) বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বনদেবতার পূজার্চনার মধ্য দিয়ে এই আদিবাসী ও অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের ধর্মচর্চা, পূজা, উৎসব ও প্রকৃতির আরাধনা ও পরিবেশ চিন্তার পরিচয় মেলে।

জঙ্গলমহলে (দ:-প: বঙ্গ) বিশেষ করে মেদিনীপুর, খড়্গপুর এবং ঝাড়গ্রাম মহকুমায় বহুল প্রচলিত লৌকিক পূজা হল— ইঁদ পূজা। এখানে দেব-দেবীর প্রতিমা নয়, প্রতীক বলেও মনে হবে না। বিরাট মাঠের মধ্যে ৪০-৫০ ফুট দীর্ঘ একটি বা দু- তিনটি শালগাছ সরলভাবে পোঁতা। শালগাছগুলির শাখা-প্রশাখা কেটে পরিষ্কার করে তার গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত কাপড় জড়ানো হয়। একটি গাছের শীর্ষ দেশে একটি বড় ঝুড়ি থাকে তাও নতুন কাপড়ে মুড়ে ছাতার মত করা হয়। ওই শালগাছগুলির একটি ইঁদ, তার মাথায় ছাতা থাকে।[৩] এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় উৎসব ও পূজা হল ইঁদ, যা প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পালিত হয়। বর্তমান পরিবেশগত সংকটের প্রেক্ষাপটে এই উৎসবের গুরুত্ব অনেকটাই বেড়ে গেছে। আমাদের সকলকে ইঁদ পূজার মূল ভাবনাকে ধারণ করে পরিবেশ রক্ষার জন্য কাজ করতে হবে।

সাঁওতাল, মুন্ডা, ভূমিজরা যখন অরণ্যের অনিশ্চিত জীবন ছেড়ে কৃষ্টি সভ্যতার পত্তন করল তখন প্রকৃতির উপরে বিশেষত রোদ ও জলের উপরে অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে গেল। ছাতা পরব বা ইঁদ পূজা সেই বৃষ্টির দেবতার পূজা অনুষ্ঠান।[৪] এই পূজা সাঁওতালদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এই উৎসব কৃষি বছরের শুরুতে পালিত হয়। তাই ওই সময় সাঁওতালরা বৃষ্টির কামনা করে, কারণ এই পূজা তাদের কাছে কৃষি ও জীবন ধারণের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রামের অরণ্যময় আদিবাসী প্রধান এই অঞ্চলের রাজা সিংহাসন দখল করার কাহিনী অথবা রাজা হওয়ার কাহিনীর মধ্যে পৌরাণিক দেবাসুরের কাহিনীর ছবিটি স্পষ্ট ভেসে ওঠে।[৫] স্থানীয় অসুর বা আদিবাসীদের পরাজিত করে বিভিন্ন রাজবংশ যখন এই অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন অথবা কোন জাতির বিশেষ কোন গোত্র বা শাখা রাজত্ব কায়েম করেছেন, তখন বিজয়োৎসব রূপে এই ইন্দ্রধ্বজের উৎসবের প্রচলন হয়েছে।[৬] পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমান্তের এই ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের মধ্যে প্রাচীন ইতিহাসের এক অবলুপ্ত সংঘাত পর্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বন থেকে ইঁদের জন্য শালগাছ আনা ও পূজান্তে তাকে বিসর্জন দেওয়া সাঁওতালরাই করে থাকে। এর সঙ্গে তুলনা করা যায়, পুরীর জগন্নাথের নব কলেবর তৈরির জন্য কাষ্ঠ আনার এবং জগন্নাথদেবের পূর্ব বিগ্রহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অধিকার কেবল দয়িতা বা শবরদের আছে। অনেকে সে কারণে এটিকে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেন যে, জগন্নাথ শবর দেবতা, সুতরাং ইঁদ বহনে সাঁওতালদের অধিকার দেখে অনুমান করা যেতে পারে— আদিতে ইঁদ সাঁওতালদের উপাস্য ছিল।[৭] একথা বলা যায় যে, এইসব প্রাচীন আদিবাসী সম্প্রদায় প্রকৃতির আরাধনার মাধ্যমে নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে পরিবেশের যে ভারসাম্য রক্ষা তা কিন্তু অলক্ষ্যে পালন হয়ে চলেছে। যা ইতিহাসে একটা নতুন আঙ্গিকে নতুন রূপে ধরা দিয়েছে বর্তমান সময়ে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় দাঁতনে খরাখাঁই নামে এক লৌকিক দেবতা রয়েছে। এই দেবতার অবস্থান— অনেকগুলি গাছের ছাউনিতে আশ্রয় করে রয়েছেন। এর কোন পূর্ণাঙ্গ মূর্তিও নেই। একটি পাথরের খণ্ড আছে। এই দেবতার থানের উপরে অতীতে ছাউনি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু বারবার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।[৮] এই পাথরের একখণ্ড শিলা বিগ্রহ দেব কিংবা দেবী কেউ জানে না। তবে নামের আভিধানিক ব্যঞ্জনায় (খরা=রোদ, খাঁই=লালসা অর্থাৎ যে রোদ পোয়াতে ভালোবাসে) মনে হয় ইনি সূর্যের প্রতীক। এখানে সাধারণ জনজাতি প্রকৃতির কোলে এই পূজাকে সূর্য দেবতা হিসেবে পূজা করে এবং প্রকৃতির সঙ্গে মেল বন্ধন করে চলেছে।

এই অঞ্চলের অপর এক জনপ্রিয় দেবী হলেন বড়াম। বড়াম দেবীর পূজা হয় সব থেকে বড় গাছ বা একাধিক গাছের ঝোপ যেখানে— সেখানে এই দেবীর মূর্তি স্থাপন করে এর পূজা করা হয়। একই ভাবে টুসুর কথা বলা যেতে পারে। টুসু পূজা কৃষকরা করে। ফসল বৃদ্ধির অভীপ্সা দেখা যায় 'তুষ-তুষালীর ব্রতে'। আবার আদিবাসীদের করম পূজা দেখা যায়, সেখানে প্রধানত আদিবাসীদের প্রাক্-শস্যোৎসব হলেও করম উৎসবের প্রচলন নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত।[৯] টুসু পূজা ধান কাটার পর নবান্ন উৎসবের অংশ হিসেবে পালিত হয়। করম পূজা নবান্নের আগে ভাদ্র মাসে করা হয় মূলত ভালো ফসলের জন্য। অর্থাৎ এই পরব প্রতুল খাদ্যশস্য উৎপাদনের আকাঙ্ক্ষা এবং উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রীর সুষম বন্টনের জন্যও এই দেবীর আরাধনা হয়। শালবনীতে এই টুসু সংস্কৃতির ধারক-বাহক শিবপ্রসাদ মাহাতোর সাক্ষ্য[১০] অনুযায়ী বিবাহযোগ্য রমণীরা অধিক পরিমানে এই দেবীর ব্রত নিয়ে আগ্রহী। কারণ টুসু দেবীকে বিবাহিত মহিলাদের জন্য একটি আদর্শ স্ত্রী হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। মেয়েরা বিশ্বাস করে যে টুসু পূজা করলে তারা একজন ভালো স্বামী পাবেন। এইখানে প্রকৃতির প্রতি আরাধনা ও তাদের বিশ্বাস এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে, সেই সঙ্গে পরিবেশের চিন্তার এক নতুন দিক উন্মোচন হয়েছে।

জঙ্গলমহলের অন্ত্যজ হাড়ি সম্প্রদায়ের প্রাণের লৌকিক বনদেবী হল— বীর ঝাপট। এখানে গাছের তলায় বাঁধানো থানে পূজা করা হয়। লোক বিশ্বাস যে এই দেবী স্মরণাতীতকাল থেকেই গ্রাম ও গ্রামের মানুষকে নানান রোগ ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করে আসছেন। এছাড়া প্রসাদেও মদ পাওয়া যায় যেগুলি চরনামৃত রূপে ভক্তরা পান করত। এই মদ প্রসাদ সন্তানবতী মহিলারা পান করত— যাতে তাদের সন্তান সুস্থভাবে জন্ম হয়।[১১] এই দিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয় প্রাকৃতিক ও সামাজিক ভারসাম্য যাতে করে বজায় থাকে সেদিকে নজর দেওয়া হয়। প্রকৃতিকে রক্ষা করা এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই পূজার্চনার দ্বারা।

মেদিনীপুর জেলার গড়বেতাতে দেখা যায় লৌকিক দেবী চমৎকারিণী। ইনিও বনদেবী ছিলেন। 'লায়েক' নামক উপজাতি পরিবার এর পূজার্চনা করেন। এই দেবতাকে পূজা করা হতো— বন্ধ্যাত্বমোচনকারিণী, নারী রোগ নিবারণী ও বৃষ্টিদাত্রী রূপে তিনি বিশেষভাবে পূজিতা হন।[১২] এখানে দেখা যায় তিনি একদিকে বৃষ্টির দেবী হিসাবে পূজা পাচ্ছেন তৎসঙ্গে সাধারণ মানুষ প্রকৃতিকে আরাধনার মাধ্যমে পরিবেশকে সুন্দরভাবে লালন করে চলেছেন। পরিবেশের প্রতি সাধারণ মানুষের কর্তব্য কি হওয়া উচিত? এই লৌকিক পূজার মাধ্যমে তা জানতে পারি।

জঙ্গলমহল অঞ্চলে (দ:-প: বঙ্গ) যুগনী (যোগিনী) দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দেবীর থান দেখা যায়— শ্যাওড়া, বটগাছ, পাকুড় ইত্যাদি গাছের তলায় এই দেবীর থান দেখা যায়। অর্থাৎ ইনি প্রকৃতির দেবী। গাছপালা, বনভূমি এবং জীববৈচিত্র্যর রক্ষাকর্তা হিসাবে পরিচিত। তাই গাছের তলায় পূজা করার মাধ্যমে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় এবং দেবীর সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়। আসলে এখানে 'প্রাচীন বৃক্ষ'-কে বাঁচানো তৎসঙ্গে দেবীর আরাধনা এক অন্য মাত্রা নিয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ধেড়ুয়ার এল্লাবনী গ্রামে 'ফুলমনি' নামে এক লৌকিক দেবীর পূজা হয়। এখানে একটি শিলামূর্তি আছে। কিন্তু ইনি বনদেবী রূপে পূজিত হন।[১৩] এখানে বনদেবীর মেলাও বসে, এই বন-জঙ্গলকে কেন্দ্র করে। আবার অপরদিকে আরেকটি পূজা লক্ষ্য করা যায়, তা হল শালোই। শালোই পূজা সাঁওতালদের পূজা। এই পূজার আগে সাঁওতালরা বনে প্রবেশ করে না। মহুয়া ফুল খায় না এবং বনের কাঠ জ্বালায় না।[১৪] অর্থাৎ এই পূজা জঙ্গলের দেবতা 'শালোই'-কে সন্তুষ্ট করার জন্য করা হয়। সাঁওতালদের বিশ্বাস যে শালোই জঙ্গলের রক্ষক এবং তিনি তাদেরকে জঙ্গলের বিপদ থেকে রক্ষা করবে ও ভালো শিকার দান করবে। শালোই পূজা সাঁওতালদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই পূজা তাদেরকে জঙ্গলের সাথে তাদের সংযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে শালোইকে সন্তুষ্ট করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনার জন্য এই পূজার আয়োজন করা হয়। এতে এই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ প্রকৃতির প্রতি আরাধনা এবং সেই সঙ্গে পরিবেশকে রক্ষা করে চলেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

জঙ্গলমহলে (দ:-প: বঙ্গ) উপজাতি— আদিবাসী ও অন্ত্যজ সমাজের পরিবেশ ভাবনা প্রকৃতির সাথে তাদের গভীর সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে তৈরি। প্রকৃতিকে তারা তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে এবং তাদের জীবিকা, সংস্কৃতি এবং ধর্মের সাথে এটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এদের পরিবেশ ভাবনা আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। প্রকৃতির সাথে তাদের

সম্পর্ক এবং প্রকৃতির আরাধনা আমাদের অনুপ্রাণিত করে এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য তাদের পদক্ষেপ আমাদের অনুসরণ করা উচিত।

তথ্যসূত্র:

১. মধুপ দে, 'ঝাড়গ্রাম-ইতিহাস ও সংস্কৃতি', মনফকিরা, কলিকাতা, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ২১৯।

কমল চৌধুরী, 'মেদিনীপুরের ইতিহাস '২য় খণ্ড, দেজ, কলকাতা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৩৪৭।

আনন্দবাজার পত্রিকা, 'সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলার বার্তা ইঁদে', কিংশুক গুপ্ত, কলকাতা, ১৩ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

২. মধুপ দে, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২১৯।

৩. বিনয় ঘোষ, 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃষ্ঠা- ৫২।

যোগেশচন্দ্র বসু, 'মেদিনীপুরের ইতিহাস', ১ম ও ২য় খণ্ড, সদেশ, কলিকাতা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ৬৯০।

৪. মধুপ দে, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২১৯।

৫. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৩।

৬. বিনয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৩-৫৪।

৭. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, 'বাংলার লৌকিক দেবতা', দেজ, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা- ১২২।

৮. তাপস মাইতি, সম্পাদিত, 'মেদিনীপুরের গ্রামের কথা-৬', উপত্যকা, মেদিনীপুর, ২০১০, পৃষ্ঠা- ১৩৫।

৯. মধুপ দে, মনফকিরা, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২১৬।

ক্ষীরোদ চন্দ্র মাহাত, 'মানভূম সংস্কৃতি', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৪৮।

১০. সাক্ষাৎকার : শিবপ্রসাদ মাহাত, শালবনী, বয়স-২৮, তাং- ২৯-১২-২০২৩, সময়- বিকাল ৫ টা।

সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত তথ্য: টুসুয়েই বা কি? আর ইহার মধ্যে কেমন বিজ্ঞানেই লুকিয়ে আছে তা বুঝতে হলে বুঝতে হবে যুগ যুগ ধরে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকভাবে মানুষের করে আসা ধানের কৃষিকে এবং একজন মহিলার ছোট থেকে বড় হওয়া, বিয়ে হওয়া, শ্বশুরবাড়ি যাওয়া, বাচ্চার জন্ম দেওয়া এবং বার্ধক্যলাভের জীবন পর্যন্ত।

রাঢ় সংস্কৃতি হচ্ছে, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি, আর এই সংস্কৃতি পুরোটাই বিজ্ঞানভিত্তিক। আর এই সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ পরব হল এই টুসু পরব।

টুসু অর্থাৎ টুই+সু। কুড়মালিতে টুই শব্দের অর্থ হল সর্বোচ্চ (ঊর্ধস্থান) এবং সু তে সুরুজ (সূর্য)। অর্থাৎ প্রকৃতির মহাশক্তির সর্বোচ্চে অবস্থান। আর এই প্রকৃতির মহাশক্তি ছাড়া মানবজীবন অচল। আর এই প্রকৃতির মহাশক্তির কারণেই সর্বোচ্চে অবস্থানের কারণে কৃষিকাজের মাধ্যমে ফসলে জীবনীশক্তি সম্মাহিত হয় এবং ফসল পূর্ণতা পায়। আমাদের ফসলে থাকা ঐ সৃজনশীল জীবনী শক্তিকেই টুসু বলে।

এক সড়পে দুই সড়পে, তিন সড়পে লক চলে।

হামার টুসু মাঝে চলে, বিন বাতাসে গা ডলে।

এই জগতে তিনটি গুণ আছে। যা হল সত্য, রজ, তম। টুসু মাঝের গুণ রজতে চলে। এই রজ গুণের কারণেই পৃথিবীর এতবড় সৃষ্টি চলছে। আর এই রজ গুণের কারণেই ধানের একটি শস্য থেকে ধানের গাছ, আর এই ধান গাছে ধানের শস্য ফলে। তা থেকে আমাদের সারাবছর ধরে জীবনধারণ হয়।

ধানের কৃষিকেন্দ্রিক কুড়মালি সংস্কৃতির বার মাসে তের পরবের শেষ পরবটিই হল এই টুসু পরব। যা কুড়মালি ক্যালেন্ডারের শেষ দিন অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তিতে পালন করা হয়।

টুসু আসলে ধানের শস্য ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধান যখন খেতে থাকে তখন তা ধানীমাঞ, আবার আঘন সাঁকরাইত দিনে ক্ষেত থেকে খামারে এনে তা হয় ডিনিমাঞ (ঠাকুরমাঞ), আর এই ধানকেই আঘন সাঁকরাইত দিনে কন্যা হিসাবে পাতালে তা হয় টুসু।

আর এই টুসুকেই পৌষ সংক্রান্তির দিন বিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ অঙ্কুরোদ্গমের জন্য প্রতীকিভাবে জলে দেওয়া।

এই ধানের শস্যকেই ধান চাষের একেবারে শুরুতেই অর্থাৎ চারা তৈরির আগে রহইন দিনে ধানপুনহা (বীজপুনহা) করা হয়। যা ধানের বীজ ফেলার শুভ সূচনা হিসাবেই পরিচিত। আর এইসময়েই এটা করার কারণ হচ্ছে এসময় যদি ধানের বীজ ফেলা হয় তা হবে ধূলাবতরে ফেলা। আর এর থেকে ধানের যে চারা তৈরি হবে তা হবে সর্বোৎকৃষ্ট। যা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক। আর এই ধূলাবতরে অনেকেই ধানের বীজ না ফেলতে পারলে অনেকে মাহারসে, আবার মাহারসে না হলে আছড়াও ফেলেন যেগুলি ধানের বীজ ফেলার আদিম যুগ ধরে চলে আসা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। আবার ধানের চারা যখন হয়ে যায়, তা ক্ষেতে রোপণ করার আগে পাঁচটা আঁটি দিয়ে ক্ষেতের উত্তর-পূর্ব কোণে বৃষ্টির কামনায় বান নামহায় (পাঁচাটি)। কারণ এই উত্তর-পূর্ব কোণ থেকেই লাগাতার ঝড়বৃষ্টির মেঘ ওঠে। এরপর ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে ধান গাছে যেই শিস নেওয়ার আগে ধান গাছ মেচায় (ধানের শিস নেওয়ার আগের অবস্থা) সে সময়েই যাতে কীট পতঙ্গরা ধান গাছের ক্ষতি না করতে পারে সেজন্য ক্ষেতে বুঁয়ান (সিরুয়াল) ডাল গাড়া হয়। এইসময় যদি ক্ষতি হয়ে যায়, তা হলে তা হবে ধান চাষের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি।

এই টুসু গীতটা একটু লক্ষ্য করুন—

পানিই হেলা, পানিই খেলা,

পানিই তহরাক কন আউহন।

ভালঅ কোরি ভাভি দেখা,

পানিই সসুরঘার আহন।

অর্থাৎ পানি শ্বশুরঘর ছাড়া সৃজন সম্ভব নয়। এই সৃজনের জন্যই টুসুকে (ধান) মকর দিনে জলে (বিয়ে) দেওয়া হয়। এরপর মাঘের প্রথম দিন যেদিন শ্বশুরঘরের প্রথম দিন সেই আখাইন দিনে হাল পুনহা (হার পুনহা) করা হয়। আর এই দিনেই আড়াই পাক হাল চালিয়ে কৃষির সূচনা করা হয়। এরপর যদি বৃষ্টি হয় তাহলে বিনা বাধাতেই ধানের চারা তৈরির জন্য জমি তৈরি করতে পারবে। এইজন্য এই দিনকেই কুড়মালি বছরের প্রথম দিন ধরা হয়। আর এই দিন থেকে আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী দিনটা ধরলে অর্থাৎ যেদিন খেতকে জাগানো হয়, সেই দিনটা দেখবেন ন'মাস হচ্ছে। গর্ভবতী মহিলাকে ন'মাসের সময় যেমন খাওয়ানো হয় ঠিক সেইরকম কারণের জন্য ওই সময় খেতের ধান গাছকে জাগানো হয়।

এরপর এই ধানকেই আঘন সাঁকরাইত দিনে ধানের কৃষির শেষ হিসাবে ক্ষেতে রাখা ধানের আঁটিকে ডিনিমাঞ করে খামারে নিয়ে আনা হয়। কোন মহিলার যদি শেষ বয়স হয় তাহলে তাকে আমরা ডিনিমাঞ, দুধুমাঞ, ঠাকুরমা প্রভৃতি বলে সম্মান করি, সেরকম অনুরূপ কৃষির শেষ স্মৃতি সম্পর্কিত ধানকে ডিনিমাঞ বলা হয়। আর ওই দিনেই নতুন ধানের শস্যকে নিয়ে টুসু পাতানো হয়।

আর পুরো একমাস বাড়িতে কন্যসম লাল-পালন করে মকর সংক্রান্তির দিন টুসুকে তার শ্বশুরঘরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়।

কুড়মালি বছরের প্রথম দিন আখান দিন থেকে শেষ দিন মকরদিন পর্যন্ত আপনারা লক্ষ্য করুন—

ধানের কৃষি সম্বন্ধিত রাঢ় অঞ্চলে যেসকল নেগনীতি, আচার-আচরণ তার মধ্যে কতসুন্দর বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে এবং তার সঙ্গে এক মহিলার জন্ম থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের অপরূপ মেলবন্ধন।

১১. অশোক মিত্র, সম্পা. 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা', তৃতীয় খণ্ড, গভ: অফ ইন্ডিয়া প্রেস, নতুন দিল্লী, ১৯৯১, পৃষ্ঠা- ২৮৯-২৯১।

হরিসাধন দাস, 'মেদিনীপুর সম্পদ', দে বুক, কলিকাতা, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা- ২৬।

হরিসাধন দাস, 'মেদিনীপুর ও স্বাধীনতা— ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক ইতিকথা', প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, রেবা দাস কর্তৃক প্রকাশিত, মেদিনীপুর, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা- ৩৩।

১২. প্রদ্যোত কুমার মাইতি, 'মেদিনীপুর— ধর্ম উৎসব ও মেলা', পূর্বাদি প্রকাশনী, তমলুক, ২০০৪, পৃষ্ঠা- ৪৯।

১৩. অশোক মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৭৯।

১৪. অশোক মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৩০৬।

Citation: **রানা. অ. কু.,** (2025) "দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের আদিবাসী ও অন্ত্যজ সমাজের প্রকৃতি আরাধনা ও পরিবেশ চিন্তা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-12, December-2025.